লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

মধ্যযুগে বাংলাদেশের আর্থ-প্রশাসনিক অবস্থা

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান *

ভূমিকা

বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক যুগ পরিক্রমায় ঐতিহাসিকবৃন্দ ১২০১ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কে 'মধ্যযুগ' বলে অভিহিত করেন। মধ্যযুগের আরম্ভ হয় ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে, যা ১২০১ বা ১২০৪ সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর এ যুগের সমাপ্তি ঘটে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বৃটিশের নিকট ১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে পরাজয়ের মাধ্যমে। মধ্যযুগের প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর এদেশে প্রধানত মুসলিম শাসকবৃন্দ শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। যার মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরের জন্য ব্যতিক্রম ঘটিয়ে রাজা গণেশ নামক হিন্দু নৃপতি ও তাঁর বংশধর (১৪১৪-১৪১৯ সাল) এদেশে রাজত্ব করেন। কতিপয় হিন্দু সামন্ত ও জমিদার বিচ্ছিন্ন ও আঞ্চলিকভাবে কখনও কখনও শাসন পরিচালনা করে থাকলেও কেন্দ্রীয়ভাবে তাঁরা শাসনক্ষমতা লাভ করেননি।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের সীমানা বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মধ্যে (যাকে অবিভক্ত বাংলা বলা হতো) সীমাবদ্ধ ছিলনা। বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যের সীমা বিভিন্ন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ও সংকুচিত হয়েছে। বিস্তৃত সীমারেখার মধ্যে বর্তমান ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসাম ও বার্মার আরাকান রাজ্য অথবা এসব এলাকার অংশ বিশেষ বাংলা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

মধূযুগে বাংলাদেশের রাজধানী ও শাসন প্রণালী বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলটি স্বাধীনভাবে শাসিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে দিল্লীর শাসনকর্তাদের অধীনে ও তাদের নিযুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা শাসিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে প্রধানত মধ্যযুগে এ দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শাসনব্যবস্থা অনুসারে মধ্যযুগের বিভাজন

শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান পরিবর্তন অনুসারে ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যা সময়ের বিভাজনের সঙ্গেই মূলত সম্পৃক্ত। নিচে চারটি ভাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো ঃ

ক) মধ্যযুগের প্রথম ভাগ (১২০১-১৩৩৮ সাল)

বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলার হিন্দু রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে (১২০১

* উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাল, মতান্তরে ১২০৪ সাল) মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে তাঁর বংশধরবৃন্দসহ উল্লেখযোগ্য অন্যান্য মুসলিম শাসক, যেমনঃ আলী মর্দান, নাসির উদ্দিন মাহমুদ, তাতার খান, শেরখান, আমীন খান, তুঘরল খান, গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ, বাহারাম খান প্রমুখ শাসকবৃন্দ এই আমলে বাংলা শাসন করেন। এ সময়ের মধ্যেকার শাসকবৃন্দ প্রধানত দিল্লীর সুলতান ও সম্রাটদের অধীনতা স্বীকার করেই এ দেশ শাসন করেছেন। মাঝে মাঝে দু'চারজন নৃপতি দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করলেও বেশীরভাগ সময় বাংলাদেশ দিল্লীর শাসনের অধীনেই শাসিত হয়েছে।

খ) মধ্য যুগের দ্বিতীয়ভাগ (১৩৩৮-১৫৭৬ সাল)

১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দীন সোনারগাঁ অধিকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা দেন। দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করে স্বাধীন সুলতানী আমল তখন থেকেই এদেশে আরম্ভ হয় এবং দু'শ' বছরেরও অধিককাল এরূপ স্বাধীন সুলতানী আমল বলবৎ থাকে। ১৫৭৬ সালে স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে সম্রাট আকবর বাংলাদেশে পূর্ণরূপে মোগল শাসন কায়েম করেন। তখন থেকে এই দেশটি আবার দিল্লীর শাসনের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। স্বাধীন সুলতানী আমলে ইলিয়াস শাহী বংশ, মাহমুদ শাহী বংশ, হাবশী বংশ ও হোসেন শাহী বংশের শাসনকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ) মধ্যযুগের তৃতীয়ভাগ (১৫৭৬-১৭১৭ সাল)

মধ্যযুগের তৃতীয়ভাগের প্রায় সম্পূর্ণ সময় ধরে এদেশে মোগল শাসন কায়েম ছিল। মোগল সম্রাটদের নিকট বাংলা একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতো এবং একজন সুবাদারের (গভর্ণর) মাধ্যমে এদেশে শাসন কার্য পরিচালনা করা হতো। বাংলার সুবাদারদের মধ্যে প্রধানত খান-ই-আজম, ওয়াজিদ খান, রাজা মানসিংহ, শের আফগান, ইসলাম খান, শায়েস্তা খান ও আজিমুস-সান উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

ঘ) মধ্যযুগের চতুর্থ ভাগ (১৭১৭-১৭৫৭ সাল)

১৭১০ সালে বাংলার দেওয়ান ও নায়েব সুবাদার (কার্যত সুবাদার) নিযুক্ত হন মুর্শিদকুলী খান। তিনি বাংলার রাজধানী মখ্সুদাবাদে স্থানান্তরিত করে নিজের নামানুসারে তার নাম দেন মুর্শিদাবাদ। তিনি অসীম ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং ১৭১৭ সালে নিজেকে 'নবাব' বলে পরিচিত করেন। দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ায় নামমাত্র দিল্লীর অধীনতা এদেশে কার্যকর ছিল এবং রাজতন্ত্র কায়েম করে সকল নৃপতিই নিজেদেরকে স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেন। এ আমলের নৃপতিদের মধ্যে মুর্শিদকুলী খান, শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান, সরফরাজ খান, আলীবর্দী খান ও সিরাজউদ্দৌলা উল্লেখযোগ্য। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বৃটিশ বাহিনীর নিকট পরাজিত হলে এদেশে প্রকারান্তরে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হয় এবং প্রশাসনিকভাবে মধ্যযুগের অবসান ঘটে।

প্রশাসনিক অবস্থা

ক) মধ্যযুগের প্রথম ভাগের প্রশাসনিক অবস্থা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজ্যের নামকরণ করেন 'লখনৌতি' বলে। তাঁর

অধিকারভুক্ত রাজ্যকে কতগুলো প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করেন। প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোকে 'ইক্তা' বলা হতো এবং সেগুলোর শাসনকর্তাদেরকে 'আমীর বা মোক্তা' নামে অভিহিত করা হতো। আমীর বা মোক্তাগণ প্রশাসনিক, রাজস্ব আদায় ও বিচার বিষয়ক দায়িত্ব পালন করতেন। ১২২৭ সাল পর্যন্ত এই রাজ্য দিল্লীর সুলতানের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করেছিল। ১২২৭ সাল থেকে ১২৮৫ সাল পর্যন্ত বেশীরভাগ সময় এই রাজ্যটি দিল্লীর সুলতানের অধীনে একটি মাত্র 'ইক্তা' হিসেবে পরিগণিত হয়।

১২৮৫ সালে তৎকালীন শাসনকর্তা বুঘরা খান দিল্লীর সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং ১৩২২ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের স্বাধীনতা বলবৎ থাকে। সে সময়ে আবারও অনেকগুলো 'ইক্তা'য় দেশটিকে ভাগ করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশের যতটুকু এলাকা তখন ঐ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সে টুকুকে 'অর্‌সহ্‌ বঙ্গালহ্‌' নামক ইক্তা হিসেবে গণ্য করা হতো। ১৩২২ সালে দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুগলক বাংলাদেশ অধিকার করে একে তিনটি ইক্তায় বিভক্ত করেন। ইক্তা তিনটির নামকরণ করা হয় লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও নামে। ঐ সময়ে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিন্যাস ও অগ্রগতি তেমন একটা সাধিত হয়নি।

খ) মধ্যযুগের দ্বিতীয়ভাগের প্রশাসনিক অবস্থা

১৩৩৮ সালে বাংলাদেশের শাসনকর্তা আবার দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন এবং রাজ্যটির নাম 'বঙ্গালহ্‌' নির্ধারণ করেন। ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রধানত স্বাধীন শাসকবর্গ দ্বারা শাসিত হয়। এসব শাসকবৃন্দ নিজেদেরকে 'সুলতান' হিসেবে পরিচিত করেন। সুলতানগণ দিল্লীর সুলতানদের মত রাজ্য শাসন প্রণালী এবং উপাধি প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ের বর্ণনা প্রধানত পাওয়া যায় 'শিং-ছা-শ্যং-লান' নামক চৈনিক বিবরণী থেকে এবং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে। সুলতানদের শাসনামলের বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

প্রশাসনিক উপাধি

সুলতানগণ তাঁদের বিশ্বাসভাজন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান্বিত ব্যক্তি, রাজ্যের অভিজাত ও ধনিক সম্প্রদায়, আত্মীয় -স্বজন এবং দক্ষ সেনাপতিদের সমন্বয়ে একটি পরিষদ গড়ে তুলতেন। রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পরিষদের সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হতো। সুলতানের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকারী নির্বাচনে এই পরিষদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। পরিষদের বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপাধি প্রদান করা হতো। এসব উপাধির মধ্যে খান মজলিস, মজলিসুল আলা, মজলিসে আজম, মজলিসুল মুআজ্জম, মজলিসুল মজালিস, মজলিস বারবক প্রভৃতি উপাধি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক সদস্যকে 'উজীর' বা মন্ত্রী আখ্যা দেয়া হতো। যুদ্ধকালে যুদ্ধ

ক্ষেত্রে যে উজীরকে নিযুক্ত করা হতো তাঁকে 'লস্কর উজীর' বলা হতো। প্রধান উজীর বা আমীরকে বলা হতো, 'খান-ই-জাহান' অথবা 'আমীর-উল-উমারা'। সুলতানের প্রধান সচিবকে 'দবীর-ই-খাস' এবং অন্যান্য সচিবকে 'দবীর' উপাধি প্রদান করা হতো। সুলতান স্বয়ং রাজ্যের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করতেন।

বিচার ব্যবস্থা

সুলতানগণ যুদ্ধ বিগ্রহ কাল বাদ দিয়ে সাধারণ সময়ে প্রায় প্রতিদিন তাঁদের প্রাসাদের বহির্ভাগে নির্মীত মজলিসে উপবিষ্ট হয়ে পারিষদবর্গ নিয়ে প্রজাদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগসহ রাজ্য শাসনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতেন। কখনও কখনও বিচারকার্যও পরিচালনা করতেন। তবে স্থানীয় পর্যায়ে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বেশ কিছু বিচারক নিযুক্ত ছিলেন, যাঁদেরকে 'কাজী' বলা হতো। বিভিন্ন অপরাধীকে ধরে এনে বন্দী করে রাখা এবং বিচারের পরে বন্দী অবস্থায় রাখার জন্য 'বন্দী ঘর' ছিল। তবে বিচারের রায়ে সাধারণত বেত্রাঘাত, অর্থ দন্ড ও নির্বাসন দন্ড বেশী দেয়া হতো। রাষ্ট্রদ্রোহীতার শাস্তি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড ছিল।

প্রশাসনিক অঞ্চল

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলাদেশকে কতগুলো প্রদেশে ভাগ করা হয়, যেগুলোকে বলা হতো 'ইকলিম'। ইকলিমের অধীনে এক বা একাধিক বিভাগ ছিল, যেগুলোর নাম ছিল 'অর্‌সহ'। এসব অরসহ কে বাংলা ভাষায় 'মুলুক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। একেকটি অর্‌সহ এর অধীনে কতিপয় অঞ্চল বিভক্ত ছিল, যেগুলোকে বলা হতো 'তকসিম'।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বাংলাদেশকে বহু রাজস্ব অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে বলা হতো 'মহল'। কয়েকটি মহল নিয়ে গঠিত হতো একেকটি 'শিক'। মহলের রাজস্ব আদায়কারীকে মহলদার এবং শিকের রাজস্ব আদায়কারীকে শিকদার বলা হতো।

সাধারণত দু'প্রকারের রাজস্ব আদায় করা হতো। যুদ্ধ বিগ্রহের পর বিজিত অঞ্চলের লুণ্ঠিত মালের এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা হতো, বাকী অংশ সৈন্যদেরকে প্রদান করা হতো। রাজকোষে জমাকৃত অংশকে 'গনীমাহ' বলা হতো। অন্য প্রকারের রাজস্বকে বলা হতো 'খরজ' বা 'খাজনা'। খাজনা প্রজাদের উৎপাদিত দ্রব্য, জমি ও অন্যান্য আয়ের উপর ধার্য করা হতো।

অনেক সময় সুলতানগণ কোন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ধার্য করে দিয়ে একটি 'শিক' বা অঞ্চলের ইজারা প্রদান করতেন। শিকদারগণ নিজেদের মনোনীত মহলদার নিযুক্ত করে প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করতেন। সুলতানকে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের পর যা উদ্বৃত্ত থাকতো তা সেই শিকদার ভোগ করতেন।

ছক : ১

স্বাধীন সুলতানী আমলে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক স্তর

বঙ্গালহ
↓
ইকলিম (একাধিক)
↓
অর্‌সহ বা মুলুক (একাধিক)
↓
তকসিম (একাধিক)
↓
শিক (একাধিক)
↓
মহল (একাধিক)

গ) মধ্যযুগের তৃতীয়ভাগের (মোগল আমল) প্রশাসনিক অবস্থা

মধ্যযুগের তৃতীয় ভাগটিকে ১৫৭৬ সাল থেকে মোগল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হলেও মোগল শাসকবৃন্দ প্রায় ৪০ বছর বাংলাদেশের সম্পূর্ণ এলাকার শাসক ছিলেন না। তাঁরা কেবল পশ্চিম ও উত্তর অংশের শাসক ছিলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ তখন বিভিন্ন জমিদার, সামন্ত, ভূঁইয়া ও স্থানীয় রাজা দ্বারা শাসিত হয়েছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিযুক্ত সুবাদার ইসলাম খান তাঁর কুটনীতি, বিচক্ষণতা ও সমরকৌশল দ্বারা সারা বাংলাদেশকে মোগল শাসনের আওতাভুক্ত করেন। তিনি তাঁর রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নাম 'জাহাঙ্গীরনগর' রাখেন। সে আমল থেকে মোগল শাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এ দেশে চালু হয়।

১৫৩৮ সালে শেরখান (শের শাহ) বাংলাদেশ জয় করেন এবং মাত্র ৩ মাস পরে সম্রাট হুমায়ুন (মোগল সম্রাট) এ দেশ দখল করে নেন। এর ১ বছর পরে পুনরায় শের শাহ এদেশ দখল করেন এবং তিনি ও তাঁর বংশধরবৃন্দ প্রায় ১৪ বছর এদেশ শাসন করেন। এরপরে কররাণী বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং ১৫৭৬ সালে পুনরায় দেশটি মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়।

প্রশাসন

মোগল সম্রাটগণ সুবা বাংলার জন্য একজন সুবাদার নিযুক্ত করে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। এছাড়া তাঁরা এদেশে রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন দিওয়ান এবং সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য একজন বখ্‌শী নিযুক্ত করতেন। সম্রাটের আর একজন কর্মকর্তা রাজ্যে (সুবায়) অবস্থান করতেন, যাঁর পদবী ছিল 'ওয়াকিয়ানবিশ' বা 'বকাইনবীশ'। একে গুপ্তচর প্রধান বলা যেতে পারে। ওয়াকিয়ানবীশ রাজ্যের সুবাদারের শাসন ব্যবস্থা, প্রজাদের অবস্থা, ষড়যন্ত্র, সম্রাটের নির্দেশ পালনসহ সম্রাটের নিযুক্ত প্রতিটি

কর্মকর্তা ও সৈন্যের সম্পর্কে গোপনে সম্রাটের নিকট সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রেরণ করতেন। ফলে সম্রাট রাজ্য শাসনের সমস্ত খুটিনাটি বিষয়ও অবগত হতে পারতেন। রাজ কর্মচারীদের মধ্যে কিছু কর্মচারীকে সম্রাট মনোনয়ন দিতেন এবং কিছু কর্মচারী সুবাদার কর্তৃক নিযুক্ত হতো। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুবাদারকে সম্রাটের মতামত গ্রহণ করতে হতো। সম্রাট কোন সুবাদারের কাজে অসন্তুষ্ট হলে অথবা সুবাদার অত্যধিক স্বাধীনতাশ্রয়ী হয়ে গেলে তার কাজ তদন্ত করার জন্য একজন উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তাকে সম্রাটের পক্ষ থেকে রাজ্যে প্রেরণ করা হতো। সুবাদারকে রাজ্যের প্রতিটি কর্মচারীর কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট রাখতে হতো। কর্মচারীদের পদোন্নতি ও পদাবনতি নির্ভর করতো সম্রাটের নির্দেশের উপর।

রাজস্ব ব্যবস্থা

মোগল আমলে ভূমির খাজনাই প্রধানত রাজস্বের উৎস ছিল। ভূমিকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হতোঃ

'খালিসা শরীফা'ঃ যে সমস্ত ভূমি প্রতক্ষ্যভাবে সম্রাটের অধীন ছিল। এরূপ ভূমির খাজনা সরকারী কর্মচারীগণ আদায় করতেন। তবে তাঁরা স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট বছর ভিত্তিক ইজারাদানের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা নিতেন।

'জায়গীর' ঃ রাজ কর্মচারীদেরকে বিশেষ বিশেষ এলাকা জায়গীর হিসেবে প্রদান করা হতো। তাঁরা ঐ এলাকার রাজস্ব আদায় করে তা বেতন হিসেবে ভোগ করতেন।

'অধীনস্থ শাসকের জমি'ঃ এ সমস্ত ভূমির খাজনা থেকে স্থানীয় জমিদার বা রাজাগণ কিছু নির্ধারিত অংশ সম্রাট বরাবরে প্রেরণ করতেন এবং বাকী অংশ নিজেরা ভোগ করতেন। এরূপ খাজনা আদায়ের দায়িত্বও ঐ সব জমিদার বা রাজাদের উপর ন্যস্ত ছিল।

ঘ) মধ্যযুগের চতুর্থভাগের প্রশাসনিক অবস্থা (নবাবী আমল)

রাজস্ব ব্যবস্থা

১৭১০ সালে মুর্শিদকুলী খান নায়েব সুবেদার নিযুক্ত হয়ে উপর্যুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ভূমির খাজনা আদায়ের জন্য নতুন ইজারাদার নিযুক্ত করেন এবং আদায়কৃত খাজনা থেকে ইজারাদারদের কিছু অংশ প্রদানের ব্যবস্থা নেন। মুসলমান কর্মচারী/ইজারাদারগণ ঠিকমত রাজস্ব জমা দিতনা বলে তিনি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু ইজারাদার নিয়োগ করে অধিক রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করেন। ফলে বহুকাল ধরে গড়ে উঠা মুসলিম ইজারাদার বা জমিদার পরিবারগুলো দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং নতুনভাবে হিন্দু ইজারাদার ও জমিদার শ্রেণী গড়ে ওঠে।

প্রশাসন

নবাবী আমলের প্রায় সকল নবাব মোগল আমলের শাসন ব্যবস্থা সামান্য পরিবর্তন করে বাকী কাঠামো পূর্ববৎ বহাল রেখেছিলেন। তাঁরা দিল্লীর সম্রাটের আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব স্বীকার করতেন এবং সুবাদার, দেওয়ান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ, উপাধি প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্রাটের অনুমোদন গ্রহণ করতেন। তবে প্রশাসনিক সকল ক্ষমতা তখন সুবাদার তথা নবাবগণ নিজেদের নিকট কেন্দ্রীভূত করে নিয়েছিলেন।

নবাবী আমলে নবাবের প্রধানমন্ত্রীর উপাধি ছিল 'দেওয়ান-ই-খালসা'। তিনি রাজ্যের রাজস্ব প্রশাসনের জন্য দায়ী ছিলেন। সেনাবাহিনীর তদারক ও বেতন প্রদানের জন্য নিযুক্ত মন্ত্রীকে বলা হতো 'দেওয়ান-ই-তান'। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে দেওয়ান-ই-তান পদে সর্বদা হিন্দু কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হতো। রাজস্ব আদায় ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে একজন 'সদর কানুনগো' নিযুক্ত থাকতেন, যা মোগল সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশেই ছিল। সদর কানুনগোবৃন্দ স্থায়ীভাবে ঐ পদে নিযুক্ত থাকতেন বলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নবাবকে তার মুখাপেক্ষী হতে হতো। নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধানকে বলা হতো বখ্‌সী এবং নৌবাহিনীর প্রধানকে বলা হতো মীরবহর। নবাব আলীবর্দীর মীরবহর ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা।

বিচার বিভাগের দায়-দায়িত্ব কাজীর উপর ন্যস্ত ছিল এবং তাঁর যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ছিল। নগর প্রশাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতেন 'কোতোয়াল'। নবাবের একটি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল, যার প্রধানকে বলা হতো 'দারোগ-ই-হরকরা'। এছাড়া প্রশাসনের সার্বিক তদারককারী, বার্তালেখক ও বিবরণলেখক হিসেবে একজন 'বকাইনবীশ' (ওয়াকিয়ানবীশ) কার্যরত ছিলেন।

নবাবী আমলে সুবা বাংলা বলতে বাংলাদেশ ও উড়িষ্যাকে বুঝানো হতো এবং নবাব আলীবর্দীর আমলে বিহার প্রদেশও সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকার্যের জন্য দু'জন 'নায়েব-ই-সুবা' নিযুক্ত করা হয়। তখন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট এলাকার জন্যও একজন নায়েব-ই-সুবা নিযুক্ত করা হয়েছিল। একে 'জাহাঙ্গীরনগর' উপ-প্রদেশ বলা হতো। নায়েব-ই-সুবা তাঁর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত করতেন।

মুর্শিদকুলী খান শাসনকার্যের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি প্রদেশে কতগুলো 'চাকলা' (বিভাগ) সৃষ্টি করেন। সুবা বাংলায় তখন ১৩টি চাকলা ছিল। চাকলার শাসনকর্তাকে বলা হতো 'ফৌজদার'। চাকলাগুলোর অধীনে ছিল কিছু পরগণা বা মহাল। ফৌজদারের দায়িত্ব ছিল চাকলার আইন-শৃঙ্খলা বিধান, রাজস্ব আদায়কারীকে সহায়তা প্রদান এবং অবাধ্য জমিদার বা প্রজা দমন।

প্রতিটি চাকলার বিচার কার্যের জন্য একজন কাজী নিযুক্ত থাকতেন। অনেক চাকলায় একজন করে কোতোয়ালও নিযুক্ত ছিলেন।

প্রতিটি পরগণা বা মহালে রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন যার পদবী ছিল 'আমিল' বা 'মুতাসাররিফ'। অনেক ঐতিহাসিকের মতে পরগণার প্রশাসককে বলা হতো শিকদার। আবার অনেকে শিকদার ও আমিল দুটি পদবীকেই রাজস্ব আদায়কারী রূপে বর্ণনা করেন। আমীলকে রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করতেন 'কারকুন' পদবীর কর্মচারী। আদায়কৃত রাজস্ব সংরক্ষণের জন্য যিনি খাজাঞ্চি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁকে 'ফোতাহদার' বলা হতো। এই শব্দটি বাংলায় পরে 'পোদ্দার' শব্দে রূপান্তরিত হয়। পরগণার গ্রাম/মৌজার ভূমির সীমারেখা নির্ধারণ ও পরিমাপের জন্য 'আমীন' নামক পদবীধারী কর্মচারী কার্যরত ছিল। পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন সংরক্ষণ ও বলবৎ করার জন্য 'কানুনগো' নামের কর্মচারী নিযুক্ত থাকতো।

স্বাধীন নবাবী আমলেও নবাবের দরবারের জন্য পরিষদ গঠিত হতো। মন্ত্রণাদাতা হিসেবে উজির, প্রধান সেনাপতি, অন্যান্য সেনাপতি, প্রধান খাজাঞ্চি, নগররক্ষক, টাকশাল প্রধান ও অমাত্য বর্গ তথা আমীরগণ কার্যরত থাকতেন।

ছক :২

স্বাধীন নবাবী আমলে বাংলার প্রশাসনিক পদসোপান

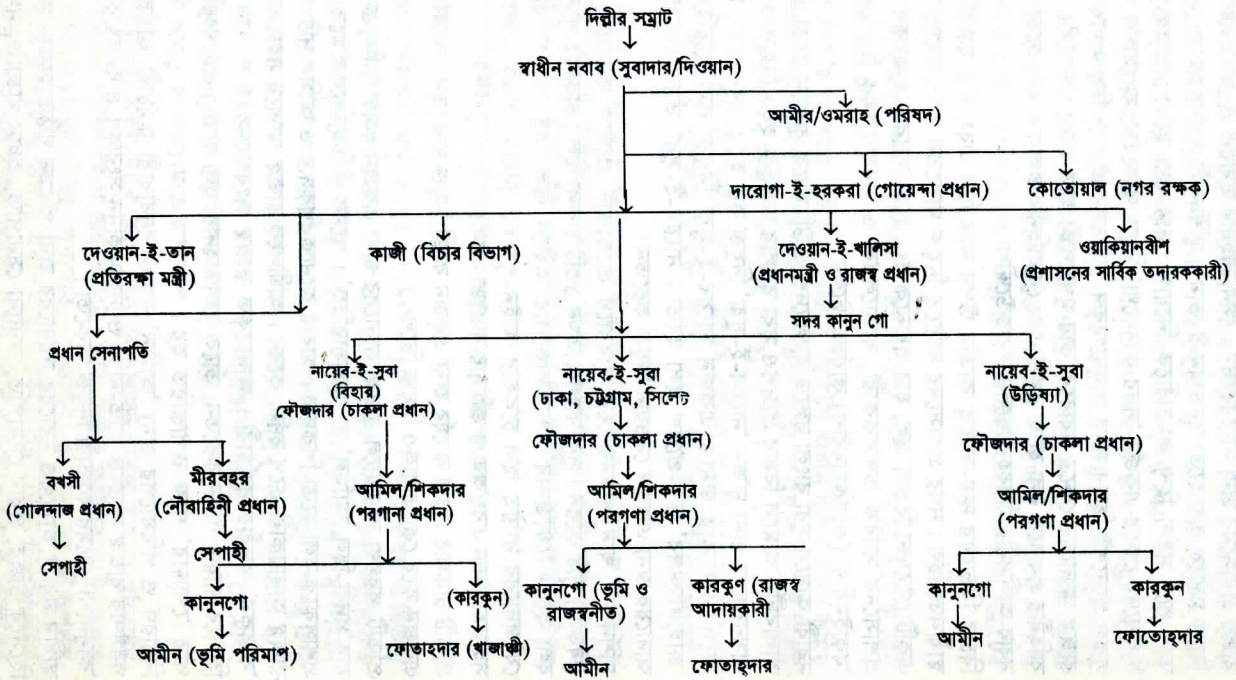

অর্থনৈতিক অবস্থা

মধ্যযুগে বাংলার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ বিরাজমান ছিল। এদেশের মৌসূমী জলবায়ুর কারণে সেচবিহীন কৃষি ব্যবস্থা, কৃষিতে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত শ্রম প্রদান, উৎপাদিত ও উদ্বৃত্ত দ্রব্যের সুলভতা, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে এদেশ প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকবৃন্দের আগমন ঘটে তুরস্ক, ইরান, খোরাসান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে এবং তাঁরা বাংলার উৎপাদিত দ্রব্যাদি মধ্য-এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশসমূহে বিক্রির জন্য বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। ফলে এদেশের উৎপাদিত দ্রব্য পূর্বের তুলনায় অধিক মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা হয় এবং জনগণ স্বর্ণ ও রোপ্যমুদ্রা প্রভূত পরিমাণে আয় করে।

মধ্যযুগের পূর্বে পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলার সঙ্গে বহির্দেশীয় বাণিজ্যের তেমন প্রসার না ঘটায় জনগণের নিকট স্বর্ণ ও রোপ্য মুদ্রা তেমন একটা ছিলনা। সর্বত্র দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রি অথবা কড়ির মাধ্যমে দ্রব্য বিক্রি ব্যবস্থা চালু ছিল। মুসলিম শাসকবৃন্দ নিজেরা স্বর্ণ ও রোপ্যমুদ্রা তৈরী ও প্রচলন করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে একে সহজলভ্য করেন। মিনহাজ নামক ঐতিহাসিকের মতে "যখন মুসলিম বিজেতারা এদেশে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা কোন রকম স্বর্ণ বা রোপ্য মুদ্রা দেখতে পাননি। ক্রয় বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহৃত হতো। এমনকি রাজা পর্যন্ত কড়ির মাধ্যমে দান ও উপহার প্রদান করতেন।" মোগল শাসনামলে বাংলার উৎপাদিত পণ্য এশিয়ার সর্বত্র বিক্রির ব্যবস্থা হওয়ার ফলে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ অধিক উৎপাদনে ব্রতী হন। ফলে এদেশ অল্প দিনেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে চারটি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রথমত কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদন, দ্বিতীয়ত বিপুল আকারের বৈদেশিক বাণিজ্য, তৃতীয়ত অত্যাবশকীয় দ্রব্যাদির সুলভতা এবং চতুর্থত দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিপুল পরিমাণে সঞ্চয়। মধ্যযুগে বাংলায় চারটি অত্যাবশকীয় উপাদান উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে ছিল এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি ধারণা করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত (আসাদুজ্জামান, ১৯৮২, পৃ: ৪৮১)।

কৃষি

অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত বাংলাদেশ পলিমাটি সঞ্জাত হয়ে অত্যন্ত উর্বরা কৃষি ক্ষেত্র সৃষ্টি করে রেখেছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। তদুপরি মৌসূমী জলবায়ুর ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাতও এদেশে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে সহায়ক ছিল। ফলে এদেশে মধ্যযুগেও কৃষিজ পণ্যের প্রাচুর্য ছিল। প্রসিদ্ধ পর্যটক ইবনে বতুতা বর্ণনা করেছেন, তিনি মেঘনার উভয় তীরে উদ্যানরাজি, শস্যপূর্ণ মাঠ ও জনবহুল গ্রামসমূহ দেখতে পান। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে পর্যটক 'বার্ণিয়ারা' বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে লিখেন যে, তিনি সমগ্র প্রদেশব্যাপী বহু নদী-নালা ও খাল-বিল দেখতে পেয়েছেন এবং এগুলোর চতুর্দিকে শস্য ও ফলে ভরা উর্বর ও সবুজ মাঠ এবং শ্রেণীবদ্ধ ঘন বসতিপূর্ণ বহু শহর ও গ্রাম সাজানো ছবির মত শোভা পাচ্ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ও দূতগণ বর্ণনা করেছেন যে, "বাংলায় পুরুষ ও রমণী উভয়ে মাঠে কাজ করে। তাদের শস্যের

মৌসুম শেষ হলে অবসর সময়ে তারা কাপড় বুননের কাজে নিয়োজিত হয়" (আসাদুজ্জামান, ১৯৮২, পৃ ৪৮২)।

মধ্যযুগে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, ইক্ষু, পাট, নীল, আফিম, লাক্ষা, সুতা (তুলা) প্রভৃতি কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতো। সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল বাংলাদেশের নানা প্রকার ফুল ও ফলের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করে বলেন "যারা সুপারী খায় তাদের মুখ লাল রঙে রঞ্জিত হয়। সুপারী ও পান বাংলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। অন্যান্য ফল যা জন্মায় তা হলো, আম, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, খেজুর, কমলা, সানতারাহ ইত্যাদি " (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯০)।

শিল্প-কারখানা

মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে রেশমী ও পশমী বস্ত্র, নানা রকম অলংকার ও সূক্ষ্ম সূচিকর্মের দ্রব্যাদি উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলার তৈরী 'মসলিন' পৃথিবী ব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। সে আমলে ইক্ষু থেকে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং এটি একটি প্রধান শিল্পে পরিণত হয়, যদিও তা কুটির শিল্পের আকারে ঘরে তৈরী করা হতো। ১৭৫৬ সালে এ দেশ থেকে ৫০ হাজার মন চিনি রপ্তানী করা হয়েছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকগণ বাংলার কার্পেট, কাগজ, ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য, কামান, বন্দুক বিভিন্ন ধাতুর অলংকারাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পের উন্নতির কথা উল্লেখ করেন। কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, লোহার জিনিষপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র ধাতব শিল্পের উন্নতির পরিচয় দেয়। বাংলায় তখন উৎকৃষ্টমানের অত্যন্ত শক্ত দু'ধারী তরবারী প্রস্তুত করা হতো।

সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উৎপাদন তখন একটি ব্যাপক শিল্পের মর্যাদা পেয়েছিল। নদী ও সমুদ্রের মাছের শুটকী প্রস্তুতকরণ শিল্পেও বাংলাদেশ অগ্রগামী ছিল। লবণ ও শুটকী বিদেশে রপ্তানী করা হতো।

বাণিজ্য

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং মুসলিম নাবিকদের সমুদ্র যাত্রায় পারদর্শিতা মধ্যযুগে বাংলাদেশকে বাণিজ্যে অগ্রগামিতা এনে দেয়। এর পূর্বে বাঙ্গালীর সমুদ্র যাত্রার ক্ষেত্রে অনীহা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের সাফল্য ও উদ্দীপনা দেখে এদেশের হিন্দু অধিবাসীগণও নৌবহরের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রথায় অগ্রণী হয়ে ওঠে। তখন বাংলার বন্দরে আরব, ইরান, পর্তুগাল, হল্যান্ড, আর্মেনিয়া ও ফ্রান্সের বাণিজ্য জাহাজের আগমন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম শাসনের প্রারম্ভেই চট্টগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়। সাতগাঁও ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি বড় বন্দর। পর্তুগীজগণ চট্টগ্রাম বন্দরকে 'পোর্টোগ্রান্ডি' (বড় বন্দর) এবং সাত গাঁওকে 'পোর্টো পিকেন্নো' (ছোট বন্দর) বলে অভিহিত করতো। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ভাগিরথী-গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে সাতগাঁও বন্দরের অবনতি ঘটে এবং হুগলী বন্দর প্রাধান্য পায়। ১৭৫০ সালে বাংলা থেকে ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী ও আর্মেনীয়গণ

বস্ত্র ক্রয় করেন ১কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। অন্যান্য দ্রব্যের মোট হিসেবে বাংলার আয় ছিল প্রায় ২কোটি টাকা (প্রাগুক্ত, পৃ; ৫০৬)।

বাংলার রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে সূতি ও রেশমী বস্ত্র, চাল, চিনি, লবণ, আদা, মরিচ, গরম মসলা, লাক্ষা, হরিতকী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। লাক্ষার বাণিজ্যে বাংলাদেশের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। বার্ণিয়ার মন্তব্য করেন যে, "পৃথিবীর আর কোথাও বাংলার মত নানা ধরনের মূল্যবান পণ্য দ্রব্য বিদেশী বণিকদেরকে আকৃষ্ট করতে দেখা যায় না" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০১)।

আর্থিক সমৃদ্ধি

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং বিদেশে রপ্তানীর ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের ফলে মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। সাধারণ অধিবাসীবৃন্দও তখন সচ্ছলতার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে বার্ণিয়ার বলেন "ভাত ও ঘি এর সঙ্গে তিনি চার রকমের তরি-তরকারী সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল এবং এসব অতি সামান্য দামে কেনা যেতো।" তখনকার দিনে বাংলার সমৃদ্ধি ও সুলভতার ফলে ইউরোপীয়দের মাঝে একটি প্রবাদ ছিল যে, "বাংলা রাজ্যে প্রবেশের শত দরজা খোলা আছে, কিন্তু ফেরবার একটি দরজাও নেই।" (প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১৩)।

চৈনিক দূতগণ উল্লেখ করেছেন যে, "বাংলার লোকেরা সোনার ও রূপার পাত্রাদি ব্যবহার করত।" আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ (ষোড়শ শতক) গৌড়ের লুণ্ঠণকারীদের বধ করে ১৩০০ সোনার থালা ও বহু ধনরত্ন পেয়েছিলেন (মজুমদার, ১৯৮৭, পৃ: ২২৫)।

সম্রাট হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড়ে এসে অধিবাসীদের স্বচ্ছলতা দেখে এ রাজ্যের নাম রাখেন 'জান্নাতাবাদ'।

মধ্যযুগে এদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে, যা হুন্ডির আকারে কার্যকর হতো। এদের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে মুদ্রার আদান প্রদান করা যেতো।

সুলভ জীবনযাত্রা

তখন এদেশে উৎপাদন (কৃষিজ ও শিল্পজ) এত বেশী ছিল যে, বিদেশে রপ্তানী করেও দেশে প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকতো। ফলে জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অত্যন্ত সস্তা ছিল। শায়েস্তা খানের আমলে বাংলাদেশে টাকায় আট মন চাল ক্রয় করা যেতো। ইটালীর বণিক 'বারথেমা' এদেশের সর্বত্র জিনিষপত্রের প্রাচুর্য ও স্বল্প মূল্য দেখে বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন যে, "পৃথিবীর মধ্যে এদেশ বসবাসের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট স্থান।" 'সিবাস্থিয়ানা' মানরিক মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের শহরগুলোতে বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য এত কম ছিল যে তিনি দিনে কয়েকবার আহার করতে প্রলুব্ধ হতেন।

প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সুলভতার একটি ধারণা ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে পাওয়া যেতে পারে। তিনি বিভিন্ন দ্রব্যের দামের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন।

পরিমাণসহ দ্রব্য	দাম (১৯৭৩ সালে ভারতীয় মুদ্রা মান অনুসারে)
১মন চাল	০.১২ টাকা
১মন ঘি	১.৪৫ টাকা
১মন চিনি	১.৪৫টাকা
১ মন তিল তেল	০.৭৩টাকা
১৫গজ উত্তম কাপড়	২.০০ টাকা
১টি দুগ্ধবতী গাভী	৩.০০ টাকা
১টি মোটা ভেড়া	০.২৫ টাকা
২টি মুরগী	০.২০ টাকা

(সূত্র : মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ; ২২৬)

উপরের বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, তখন বাংলাদেশে জীবন যাপনের দ্রব্যাদি অত্যন্ত সুলভ ছিল। একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালী মুসলমান ইবনে বতুতাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি, তাঁর স্ত্রী ও একজন ভৃত্যের খাদ্যের জন্য সারা বছরে ১টাকা ব্যয় হয়।

উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী কাগজপত্রে বাংলাদেশকে বলা হতো 'ভারতের স্বর্গ' (মজুমদার, ১৯৮৭, পৃ: ২২৭)। ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক শোভা, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্য সম্ভার এবং জীবন যাত্রার স্বচ্ছলতার কারণেই এরূপ মন্তব্য করা হতো। তবে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের পাশাপাশি এদেশের শাসনকর্তাদের মধ্যে সিংহাসন দখল করাকে কেন্দ্র করে এত বেশী যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছিল যে সর্বদাই অধিবাসীদেরকে উৎকণ্ঠিত থাকতে হতো। তাঁদের ধন সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে বহুবার।

মধ্যযুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি (যা প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সম্পর্কে এ প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে) অত্যন্ত সফল ছিল। ফলে নতুন শাসনকর্তাকেও রাজস্ব আদায়ে বেগ পেতে হয়নি। প্রশাসনিক স্তর নির্ধারণ ও পদসোপান যেভাবে রচিত হয়েছিল, তা আজও বহুলাংশে অনুসৃত হয়ে আসছে। বর্তমান বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় মধ্যযুগের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা অনেকাংশে অনুসৃত হয়, এমনকি আমীন, কানুনগো প্রভৃতি পদবীসমূহও ব্যবহৃত হচ্ছে। দুই শত বছর বৃটিশ রাজত্বের সময়ও এদেশের রাজস্ব আদায় ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় মধ্য যুগের পদ্ধতি অনেকাংশেই অনুসৃত হয়েছে। তবে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিষদ, মন্ত্রীসভা, সেনাবাহিনী

প্রভৃতির গঠন প্রণালীও মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থা থেকে অনুকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় যে মন্থরতা ও অশ্রেণীবদ্ধতা ছিল, মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থা তা রাতারাতি পাল্টে দিয়ে প্রশাসনে একটি বিধিবদ্ধ ও সার্থক বিবর্তনের জন্ম দিয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

১। মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পাঃ) ১৯৮৭, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:।

২। বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস, ১৯১৭, *বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)*, কলিকাতা।

৩। সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৩৪১, *বৃহৎবঙ্গ*, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। সেন, সুকুমার, ১৩৫২, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

৫। বন্দোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন, (মজুমদার রমেশ চন্দ্রের (সম্পা) গ্রন্থে উদ্ধৃত) ১৯৮৭।

৬। আসাদুজ্জামান, মোহাম্মদ ও ফজলে রাব্বি (অনুঃ) ,১৯৮২, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১৫৭৬-১৭৫৭) দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

৭। বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৪৬, *চৌনিক বিবরণ বিশ্বভারতী বার্ষিকী*, ১৯৪৫ বর্ষ, প্রথম খন্ড (পৃঃ ৯৬-১৩৪), কলিকাতা।